মৃত রফিককে দেখে গাফ্ফার চৌধুরীর একুশের গান

অলকানন্দা মালা

২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রহরেই মনে পড়ে ৭০ বছর আগের সেই দুপুরের ঘটনা। সে ইতিহাস সবার জানা। ১৪৪ ধারা ভেঙে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা ভাষার দাবীতে রাজপথে নেমে এসেছিল। সরকারের পেটুয়া বাহিনির গুলিতে হয়েছিল শহীদ। ওই শহীদদের রক্তের দামেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছিল বাংলা। যে বীর সন্তানদের বুকের তাজা রক্তের দামে ভাষা পেয়েছিল তার প্রাপ্য সম্মান, তাদের অবদান ও ত্যাগের কথা ভোলেনি এদেশের মানুষ। শহীদ রফিক জব্বার বরকতদের ত্যাগের কথা উঠে এসেছে লেখক কবি শিল্পীর সৃষ্টিতে। সিনেমায়, উপন্যাসেও দেখা গেছে জাতির এই সূর্যসন্তানের আত্মত্যাগের কথা। সেইসঙ্গে কবিতা, গানেও ধরা দিয়েছে ইতিহাস। ১৯৫২ সালের ওই দিনকে ঘিরে একাধিক গান-কবিতা রচিত হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে প্রথম গান লিখেছিলেন কবি ও গীতিকার অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী। এতে সুরারোপ করেছিলেন প্রখ্যাত গণসংগীতশিল্পী শেখ লুৎফর রহমান। গানটি ছিল 'শোনেন হুজুর, বাঘের জাত এই বাঙালেরা, জান দিতে ডরায় না তারা, তাদের দাবি বাংলা ভাষা, আদায় করে নেবে তাই।' কিন্তু একুশের যে গানটির কথা না বললে অসম্পূর্ণ থাকে ইতিহাস সেটি হলো, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' সাংবাদিক, কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা এই গান মনে পড়লেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হয়ে আসে। ভাষার দাবীতে প্রাণ দেওয়া ভাইয়ের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যুগ যুগ ধরে এই গান শ্লোকের মতো আউড়ে আসছে বাঙালি।

তবে গানটি আপামর বাঙালির অতিপরিচিত হলেও অনেকেই জানেন না এর ইতিহাস। কবে কিভাবে সৃষ্টি হলো এই গান সে প্রশ্নের উত্তর অনেকেরই অজানা। গানটির রচিয়তা প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী তখন ঢাকা কলেজের বিদায়ী ছাত্র। রাজপথে সেদিন ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোর সংবাদ পেয়েছিলেন। ছুটে গিয়েছিলেন আত্মাহুতি দেওয়া বীরদের দেখতে। ঢাকা মেডিকেলের বারান্দায় পা রাখতেই একটি লাশ দেখতে পান তিনি। ঘাতকের গুলিতে খুলি উড়ে গেছে। আবদুল গাফফারের মনে হতে থাকে এ যেন তারই ভাইয়ের লাশ। সেই অনুভুতি থেকেই সেদিন সৃষ্টি হয় কালজয়ী এই গানটির প্রথম দু'লাইন, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...'। সেদিন মেডিকেলের বারান্দায় পড়ে থাকা খুলিহীন ওই লাশটি ছিল রফিকের। ঘটনার পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবীতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গায়েবি জানাজার ইমামতি করেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী। সে জানাজায় গাফফার চৌধুরীও ছিলেন। জানাজা শেষে শুরু হয় গণমিছিল। পুলিশ সশস্ত্র হামলা করে শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর ওপর। লাঠির আঘাতে আহত হন গাফফার চৌধুরী। তাকে প্রথম নেওয়া হয় কার্জন হলে। পরে গেন্ডারিয়ায় এক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নেন তিনি। সেখানেই পুরো গান লেখা শেষ করেন তিনি।

তবে গাফফার চৌধুরী তখনও ভাবেননি গান হতে পারে এটি। লিখেছিলেন ত্রিশ লাইনের একটি কবিতা। বরকত জব্বারদের হারানোর ক্ষত তখন ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল ছাইচাপা আগুন হয়ে। গেন্ডারিয়ার গোপন সভায় একটি ইশতেহার প্রকাশ করে দাবী আদায়ে সোচ্চার হয় যুবসমাজ। ওই ইশতেহারেই প্রথম প্রকাশ পায় কবিতাটি। এরমধ্যে কবিতাটি গিয়ে পড়ে গণসংগীতশিল্পী আবদুল লতিফের হাতে। তিনিই প্রথম সুর করেন এতে। ১৯৫৩ সালে গুলিস্তানের ব্রিটেনিয়া হলে ঢাকা কলেজের নবনির্বাচিত ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে আব্দুল লতিফ ও আতিকুল ইসলাম গানটি পরিবেশন করেন।

পরে রীতিমতো অস্ত্র হয়ে ওঠে আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতা। ফলে কবিতাটি ভীতির কারণ হয়ে ওঠে পশ্চিমা শাসকদের। তার প্রমাণ মেলে ঢাকা কলেজে শহীদ মিনার স্থাপনের সময়। সেসময় ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে কিছু ছাত্র শহীদ মিনার স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। তখন তারা গাইছিল ভাই হারানোর গানটি। এটাই ছিল তাদের অপরাধ। এ অপরাধে ওই ছাত্রদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করে শাসকগোষ্ঠী। সরকারি পেটুয়া বাহিনীর চক্ষুশূল হয়েছিলেন আবদুল লতিফও। এই গান করার অপরাধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় তার নামে। তার বাড়িতেও হানা দিয়েছিল পুলিশ। এ সময় বহিষ্কৃত ওই ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান মাওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাদের অনুরোধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ বহিষ্কারাদেশের জন্য তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানালে বহিষ্কারাদেশ তুলে নেওয়া হয়।

আবদুল লতিফের সুর করা গানটি তখনও একটি নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল। গানটি সকলের মাঝে আনেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ। ধারণা করা হয় ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি কিংবা ৫৪ সালে আলতাফ মাহমুদ এতে নতুন করে সুরারোপ করেন। ১৯৫৪ সালে নিজের সুরে গানটি পরিবেশন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। এরপরের ইতিহাস সবার জানা। সবাই সাদরে গ্রহণ করে গানটি। তবে গানটিতে নতুন সুর করতে আলতাফ মাহমুদের সময় নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি পুরো কবিতাটি গাইতেন। পরে নিজের আরোপিত সুর ভাঙতে থাকেন তিনি। এক সময় কবিতাটির শেষ ছয় লাইন আবদুল গাফফার চৌধুরীর অনুমতি নিয়ে গান থেকে বাদ দেন। একাধিক প্রচেষ্টায় আলতাফ মাহমুদ পান সেই কাঙ্ক্ষিত সুর, যে সুর কণ্ঠে তুলে প্রতিবছর প্রভাতফেরীতে নামে জনতার ঢল। এরপর সুর সম্পর্কে মতামত চাইতে যান গণসংগীতের দুই দিকপাল শেখ লুতফর রহমান এবং আব্দুল লতিফের কাছে। নিজের সুরারোপিত গানে নতুন করে সুর বসানো মোটেই অনাধিকার বলে মনে করেননি আবদুল লতিফ। তারা দুজনেই বর্তমানে প্রচলিত সুরটি পছন্দ করেন। আবদুল লতিফ তখন নিজের সুরটি প্রত্যাহার করে নেন।

এ গানের উপযুক্ত মূল্যায়ন করেছিলেন লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। গানটির ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল লতিফের সুরটি মন্দ ছিল না। কিন্তু কিসের যেন অভাব ছিল তাতে। আলতাফ মাহমুদের নতুন সুরে জনতার কর্ণে যেন মধু ঢেলে দিল। কী ভীষণ মাদকতা, কী ভয়ংকর আকর্ষণ সে সুরের! গানের এক একটি কলি তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলেই শ্রোতা যে অবস্থায় এবং যেখানেই থাকুক নিজের মন নিজের কাছে ধরে রাখতে পারেন না।' এই লেখকের কথা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। আলতাফ মাহমুদের সুরে গানটি এতটাই জনপ্রিয় হয় যে বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের নিকট হয়ে ওঠে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর গান।

অনেকে শুনতে চায় গানটিতে বসানো আবদুল লতিফের সুর। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি সে সুরের খোঁজ আর কেউ রাখেনি। শত চেষ্টায়ও সে সুরের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু তাই বলে আবদুল লতিফের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা তিনিই প্রথম কবিতাটিকে গান বানান। তা না হলে হয়তো কবিতা হয়েই থেকে যেত।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা, আলতাফ মাহমুদের সুরে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানটি বিবিসি শ্রোতা জরিপে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। কালজয়ী গানটির স্রষ্টাদের কেউই আজ আর নেই। সুরকার আলতাফ মাহমুদ এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। গানটির রচিয়তা গাফফার চৌধুরীও অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন বছর হয়ে এলো। শহীদ দিবস পেয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'র স্বীকৃতি। গানটিও ছড়িয়ে পড়েছে ভিনদেশিদের কাছে। বর্তমানে এটি হিন্দি, মালয়, ইংরেজি, ফরাসি, সুইডিশ, জাপানিসহ ১২টি ভাষায় গাওয়া হয়।